৭১ এর খোয়াই

আ. স. ম জিয়াউদ্দিন

তখন কত বয়স হবে আমার? মাত্র তৃতীয় শ্রেনীতে উঠেছি জানুয়ারীতে। আব্বার চাকুরীর সুবাদে আমরা থাকতাম তৎকালীন সিলেট জেলার (বর্তমানে হবিগঞ্জ জেলার) শায়েস্তাগঞ্জে। দুটা বিশেষ কারনে ১৯৭১ সালের সকল উত্তাপ আর উত্তেজনা আমাদের কাছে খুবই বাস্তব ছিল। প্রথমত আমাদের বাসা ছিল শায়েস্তাগঞ্জ প্রধান সড়কেরের একটা চার রাস্তার মোড়ে। এক পাশে ডাক বাংলার মাঠ - যেখানে প্রতিদিন সভা সমাবেশ লেগে থাকতো, অন্যদিকে হবিগঞ্জগামী সড়ক যেখান দিয়ে হবিগঞ্জের বৃন্দাবন কলেজের ছাত্ররা মিছিল নিয়ে যাতায়ত করতো। বিশেষ করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ছাত্রদের মিছিল সমুহই ছিল আমাদের প্রধান আকর্ষন। বাসার সীমানা দেওয়ালের উচ্চতা কম থাকায় জানালা পাশে দাড়িয়ে মিছিলগুলো সহজেই দেখতে পেতাম। আমাদের তখন ৯ ভাইবোন। বড় দু'জন মুন্সীগঞ্জে নানার বাড়ীতে থাকে আর বাকী সাত জনের বিশাল মেলায় এক উৎসব মুখর পরিবেশ লেগে থাকতো আমাদের বাসায়। দ্বিতীয় যে কারনটা আমাদের জন্যে ছিল উত্তেজনার তা হলো বাসার সান্ধ্যকালীন আড্ডা। আব্বা শ্রমিক রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার সুবাদে সন্ধ্যায় বাসায় আসতেন হবিগঞ্জের সাঈদুর উকিল, শায়েস্তাগঞ্জের পুরান বাজারের ডাঃ জিতু মিয়াসহ আরও অনেকে। এর সাথে যোগ দিত স্থানীয় ছাত্র নেতারা। পরিস্থিতির অবনতির কারনে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়ী ফরেরা ছাত্ররাও ছিল সেই আড্ডা সদস্য। আড্ডা চলতো গভীর রাত অবধি। আলোচনা হতো দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে - আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। এর মধ্যে বেশী শুনা যেত শেখ মুজিব আর মাওলানা ভাসানী, মনি সিং আর প্রফেসার মোজাফফরের নাম ।

১৯৭০ সালের সাধারন নির্বাচনের পিডিপির প্রার্থীর একটা ক্যাম্প ছিল আমাদের বাসার ঠিক উল্টা দিকে। খুব কমই লোকজন সেখানে থাকতো। অন্যদিকে আওয়ামী লিগের ক্যাম্পের সামনে প্রচন্ড ভীড়, সেটা ছিল একটু দুরে। আমার মেজভাই, যে কিনা ভাইদের মধ্যে তখন বড় ছিল - সে আব্বা-মাকে লুকিয়ে পিডিপির ক্যাম্পে চলে যেত মিষ্টি আর জিলাপী আনার জন্যে। এক সময় নির্বাচন শেষ হলো। আওয়ামী লীগ জিতে গেল। সেই রাতেই পিডিপির ক্যাম্প ভেঙে মানুষ জন সর্বকিছু নিয়ে গেল।

সেই সময়ের একটা কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে। চা বাগানের কুলিরা আসতো আব্বার অফিসে। এমন একজন একদিন জিজ্ঞাসা করলে - সাহাব ভোট দিলামতো শ্যাক সাবরে, মানিক মিয়া জিতে কি কোরে? কি সহজ সরল প্রশ্ন। কিন্তু এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল শেখ মুজিবের প্রতি মানুষের আস্থা আর বিশ্বাস।

সময়ের সাথে পরিস্থিতি ক্রমাগত খারাপ হতে লাগলো - রাত্রে মশাল মিছিলের সংখ্যা আর আয়তন রেড়ে গেল। প্রতি রাত্রেই মিছিল হতো - মিছিল থেকে শ্লোগান হতো - "জয় বাংলা", "জয় বঙ্গাবন্ধু", "তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা" "আপস না সংগ্রাম সংগ্রাম সংগ্রাম"। আমার মনটা বিশেষ ভাবে খারাপ থাকতো কারন তৃতীয় শ্রেনীতে উঠার পর নতুন বই পাইনি - স্কুলের তো প্রশ্নই উঠে না। এদিন শুনা গেল স্কুলের হেডস্যার নিবাস বাবু ভারত চলে গেছেন। এভাবে দিনভর মিছিল- সভা আর রাতে মশাল মিছিল দেখে আর আর মেজ ভাইএর আমদানী করা নানান গুজব শুনে আমাদের দিন কমাটামুটি কেটে যাচ্ছিল।

একদিন ভোরে আব্বার পিয়ন ছিয়া সিং এর প্রচন্ড ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকাডাকিতে আমাদের ঘুম ভাঙলো। সেটা সম্ভবত ২৬শে মার্চ। সে চিৎকার করে বলছে - "সাহেব, আপনি বলেছিলেন কিছু হবে না - ডাকায় লাক লাক আদমী মরে গেল।" আমরা সবাই ঘুম থেকে উঠে বসে আছি । কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অন্যদিকে সিয়া সিং এর কথাও তেমন বিশ্বাস করা যাচ্ছে না কারন প্রায় রাত্রেই সে মদ্যপান করে চিৎকার করে কাঁদে - আবোল তাবোল বকে। বিহারে অধিবাসী সিং ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখান একা একা থাকে। তাই মদ্যপানের পর তার পরিবারে কথা মন হয় আর কাঁদে। কিন্তু সেটা তো রাতে বেলা। এই অবস্থায় পাশের বাসা থেকে একজন একটা রেডিও নিয়ে এলো। সবাই বসে রেডিও শুনলো আর আলোচনা চলতে থাকলে কি হবে আর কি করা যাবে। একটা সময়ে সবাই নিশ্চিত যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে ।

যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে কলোনীর মাঠে শুরু হলো যুবকদের ড্রিল আর লাঠি চালানো শিক্ষা। যারা বিশেষ ভাবে উৎসাহিত ছিল যুদ্ধের জন্যে তাদের কয়েকজনের নাম বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে - তাদের মধ্যে মকবুল, ঈদ্রিস, গফুর, সুকুমার

বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে চললো তীর ধনুক বানানো আর মেয়েরা মরিচ গুড়া করে প্যাকেট করা। একটা নিরস্ত্র জাতির পাকিস্থানি মানবরূপী পশুদের বিরুদ্ধের অসম লড়াইয়েব এই বিচিত্র কিন্তু বীরত্বপূর্ন সাহসী প্রস্তুতি সত্যি আরো অনেক স্বাধীনতাকামী সাহসী জাতির অনুপ্রেরনা হতে পারে।

আব্বা মা সারাদিন বিমর্ষ হয়ে কথা বলতো। আমাদের গ্রামের বাড়ী মুন্সিগঞ্জের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সেখানে চলে যাওয়ার চিন্তা করা যাচ্ছে না। মেঝ ভাই, যার বয়স ছিল সে সময় ১৩/১৪ বৎসর, সে একদিন এসে আব্বাকে বললো সে ভারতে চলে যাচ্ছে একটা দলের সাথে সাথে – কারন এখানে থেকে আর্মির হাতে মরার চেয়ে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে মরা অনেক ভাল। মা কান্নাকাটি শুরু করলো। এরই মধ্যে একদিন আমাদের প্রাইভেট টিউটর লস্করপুরের আদ্য পাশা স্কুলের শিক্ষক শহীদ স্যার এসে আব্বার সাথে কিছুক্ষন আলোচনা করলেন। পরদিন আমরা সবাই চলে গেলাম লস্করপুরের বালুচর নামক গ্রামে। প্রথম দর্শনই গ্রামটা আমাদের সব ভাইবোনের পছন্দ হয়ে গেল। এর কারন হচ্ছে গ্রামের পাশ দিয়ে বহমান খরস্রোতা খোয়াই নদী। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় যাতে হাটু পানি থাকে। চমৎকার প্রবাহ আর কলকল শব্দ। আমাদের সেই গ্রামের অবস্থানের প্রথম কয়েকদিনের বেশিরভাগ সময় নদীর কাছে বা নদীতেই থাকতাম। তবে আব্বা বন্ধের দিনগুলো ছাড়া অন্যদিনগুলো শায়েস্তাগঞ্জের বাসাই থাকতো। বাসার মালামাল চুরি হওয়া ছাড়াও নিয়মিত অফিস করা ছিল উনার কাজ।

সম্ভবত এপ্রিল মাসে মাঝামাঝি সময়ে শায়েস্তাগঞ্জে পাকিস্থানী বাহিনী প্রবেশ করে। তখন কয়েকদিন আব্বা আমাদের সাথে থাকলেন। পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হরে একদিন গিয়ে দেখেন বাসার সব মালামাল লুট হয়ে গিয়েছে। শুনা যাচ্ছিল বিহারীরা সব কিছু লুট করে নিয়ে গিয়েছে। সুতরাং বাসায় থাকার আর কোন কারন নেই। আব্বার মনে মধ্যে একটা ভীষন চাপ নিয়ে কয়েকদিন আমাদের সাথে গ্রামে থাকলো। চাপটা ছিল তার অফিসে বেশ কিছু টাকা জমে ছিল এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারনে সে টাকা ঢাকায় পাঠানো যায়নি। শহীদ স্যার আর অন্যান্যদের সাথে আলোচনার পর আব্বা শায়েস্তাগঞ্জে গেলেন খুবই ভোরে, যাতে হেঁটে যেতে সুবিধা হয় আর দিনে দিনে ফিরে আসা যায়।

আমরা আশা করতে লাগলাম আব্বা আসবেন দুপুরে। রাত্রেও বসে থাকলাম এক সাথে সবাই খাবো বলে– কারন এক সাথে সবাই বসে খাওয়া ছিল আব্বার পছন্দের একটা কাজ। কিন্তু রাত্রেও যখন আসলেন না, আমরা চিন্তায় পড়ে গেলাম। বাড়ীর অন্যান্যরা বললো হয়তো সকালে আসবে । এভাবে একদিন – দুইদিন – সাতদিন হয়ে গেল। তখন দেখলাম সে বাড়ীর মানুষজনের ব্যবহার যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলাম পুরুষ মানুষরা নতুন দাড়িঁ রাখার কারনে কেমন রুক্ষ ভাব ধারন করেছে। এ পর্যায়ে দেখলাম সে বাড়ীর বাচ্চারা আমাদের সাথে খেলতে আসছে না। একদিন একজনকে ধরে জিজ্ঞাসা করতে সে –"বললো তোমরা আওয়ামী লীগ। তোমাদের আব্বাকে মিলিটারী মেরেছে এবং তোমাদেরও মারবে।" মনে আছে আমরা ভাইবোনরা সারাদিন কেঁদেছি আব্বাকে মেরে ফেলেছে শুনে। পরিস্থিতি একটা গুমট হয়ে গিয়েছিল যে একটা বাচ্চা ছেলের কথা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না আব্বার সংবাদ পাওয়ার। বড়রা আমাদের দেখলে কেমন যেন শক্ত হয়ে যেত – মহিলারা ঘোমটার মধ্যে ডুবে যেত।

সেই গ্রামের এক অধিবাসী এক রাত্রে এসে আমাদের চুপি চুপি চুপি কিছু কথা বলে গেল। যার মর্মার্থ হচ্ছে – সে নিশ্চিত যে আমাদের আব্বা আর নেই। শুনা গেছে তাকে শ্রীমঙলের দিকে নিয়ে গিয়েছে। শ্রীমঙ্গাল হচ্ছে আর্মির বড় ক্যাম্প এবং ওখানেই ওরা বেশী মানুষ মারছে এবং নদীতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এখন একটা কাজই কেবল আমরা করা উচিৎ – তা হচ্ছে, কাল থেকে নদীর পাড়ে বসে লাশ চেনার চেষ্টা করা। সে বললো – যদি লাশ চিনতে পারি, তাকে যে ডেকে নিয়ে আসি। যত বিপদই হোক সে লাশ নদী থেকে উঠাবো কারন আব্বা ভাল মানুষ ছিলেন। সুতরাং এমন একজন ভাল মানুষের জানাজা আর দাফন না হলে সবাই দোজখে যাবে।

এই কথা শুনার পর থেকে আমাদের রাত্রের ঘুম শেষ। জেগে অপেক্ষায় করছি কখন সকাল হবে – কখন যাবো নদীর পাড়ে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম। সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে রৌদ্র দেখে মনটা ভাল হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি ভাইরোনরা কেহ আশপাশে নেই। এ দৌড়ে নদীর পাড়ে চলে গেলাম। খোয়াই নদী যারা দেখেননি তাদের জন্যে বলা – এটা আর দশটা নদীর মতো নয়। এর পাড় হচ্ছে অনেকটা উঁচু – মোটামুটি একটা টিলার মতো। ভিতরদিকে একটু সমতল জমির মতো, এরপর নদী। এ দৌড়ে উপরে উঠে ভাইবোনকে খোঁজার আগেই চোখ চলে গেল নদীর দিকে। দেখি বেশ কয়েকটা লাশ ভেসে যাচ্ছে। মুহূর্তে মধ্যে নদীর সৌন্দর্য্য ম্লান হয়ে গেল আমার কাছে। সবচেয়ে কাছ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে যে লাশটা তার উপর বসে আছে দু'টা কাক। এগিয়ে গেলাম ভাল করে দেখার জন্যে। দেখলাম লাশের গায়ে তেমন কাপড় নেই, উপুর হয়ে ভেসে যাচ্ছে । হাত দুইটা দড়ি দিয়ে পিছনে করে বাঁধা।

শরীরের মাংস খুলে পরে গেছে অনেকটুকু, বিভৎষ দৃশ্য। মোটামুটি নিশ্চিত এটা আব্বার লাশ না। পিছন ফিরে দেখি আমার অন্য ভাইবোনরা আমার পিছনে দাড়িয়ে আছে। কখন যে এসেছে সবাই বুঝতেই পারিনি - ক্লান্ত দৃষ্টি আর অনিশ্চয়তার ছাপ সবার মুখে। জানলাম ওরা অনেক্ষন ধরে আছে নদীর ধারে। সবাই বসে পড়লাম একটা গাছে নীচে । দুর থেকে ভেসে আসা লাশ দেখছি। গায়ের কাপড় বা শাররীক অবয়ব দেখে যদি মনে হয় বাবার মতো, কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে দেখে আসছি। এরই মধ্যে শহীদ স্যারসহ অনেকে এসে দেখে গেছে আমাদের। অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেছেন - কেহ পরামর্শ দিয়েছে আমাদেরকে কিভাবে প্রার্থীত লাশ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এক পর্যায়ে ক্ষুধার্থ হয়ে গেলে পালা করে খেয়ে আসা আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লাশের পর্যবেক্ষন করা চললো সারাদিন। আমরা কখনও চোখ ফিরাতে পারিনি নদী থেকে কারন ক্রমাগত লাশ ভেসে আসছে -একটা - দুইটা - তিনটা ..... পঞ্চান্ন - ছাপ্পান্ন - সাতান্ন ... অগুনতি। কখনও একটা, কখনও জোড়া জোড়া, কখনও বা দলবদ্ধ গুচ্ছাকারে। মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলি গুনতি। ক্লান্ত হয়ে যাই গুনতে গুনতে - কিন্তু আমাদের লাস পর্যবেক্ষন শেষ হয় না। এই অবস্থায় একদিন একটা লাশের গায়ে গাঢ় নীল শার্ট দেখে বোনরা চিৎকার করে উঠলো। আব্বা যেদিন আমাদের ছেড়ে চলে যায় সেদিন তার পরনে ছিল নীল শার্ট আর খাকী প্যান্ট। এগিয়ে এলো কয়েকজন জাল নিয়ে। নদীর পাড়ে এনে দেখা গেল সেটা আমাদের প্রার্থী লাশ নয়। বোনেরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। উপস্থিত জনতা সান্তনা দিতে লাগলো। তারপর আবার শুরু হলো পর্যবেক্ষন ...অপেক্ষার পালা...।

এভাবে যে কতদিন চলতো তা বলা কঠিন ছিল। এর মধ্যে এদিন বিকালে ধবধপে সাদা পাঞ্জাবী পড়া টুপি মাথায় কিছু আমাদের পিছনে এসে দাড়িয়ে কিছুক্ষন আমাদের দেখে চলে গেল। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে গেলে শুনলাম মা'র কান্না আওয়াজ। জানতে পারলাম আমাদের আজ রাতের মধ্যে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে হবে । কারন শান্তি কমিটির লোকজন চেয়ারম্যান এসে বলে গেছেন - একটা আওয়ামী লীগ পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া কারনে আর্মী ক্যাম্প এই বাড়ীর দিকে নজর রাখছে। সুতরাং এদের বের করে না দিলে আর্মির দিক থেকে যে কোন সময় বিপদ আসতে পারে। এই অবস্থায় বাড়ীর কর্তা আমাদের আলটিমেটাম দিয়ে দিয়েছেন।

সন্ধ্যা থেকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল -মধ্য রাত্রে শুরু হলো তুমুল বর্ষন। টিনের চালে বৃষ্টি ভারী শব্দ আমাদের উদ্বেগকে স্পর্শ করতে পারছিল কিনা মনে নেই। তবে আমাদের অজানা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি চলতে লাগলো। গভীর রাত্রে বাড়ীর লোকজনের থেকে একজন উঠে এসে আমাদের বললো তার কাছে খবর এসেছে হবিগঞ্জ শহরের আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে, সেখানে গেলে আশ্রয় পাওয়া যাবে। সুতরাং সেখানেই যাওয়া ঠিক হলো আর বাড়ীর কাজের যুবক ছেলেটা আমাদের সাথে যাবে ঠিক হলো। রাত্রির শেষে তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। ফজর নামাজের আজান মৃদু স্বরে যখন শুনা যাচ্ছিল - তখন বাড়ীর কর্তা এসে একরকম ঠেলে আমাদের বের করে দিলেন। শুরু হলো আমাদের অজানার পথে চলা। সেই খোয়াই নদী - যা দিয়ে তখনও হয়তো ভেসে যাচ্ছিল লাশ, অন্ধকার আর বৃষ্টির কারনে নদীটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। সে ই নদীর পিচ্ছিল পাড় ধরে হবিগঞ্জ নামক এক জনপদের দিকে যাত্রা চলতে লাগলো। সবার মন খারাপ হচ্ছিল এ ভেবে যে আব্বার লাশ আর পাওয়া যাবে না - কিন্তু কিছুটা স্বস্তি এসেছিল মনে এ কারনে যে - প্রতিদিন অসংখ্য বিভৎষ লাশ আর দেখতে হবে না। মা মেজ বোনকে ধরে হাটছিলেন আর বারবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন। যখনও আমার বয়স তেমন হয়নি যে বুঝতে পাড়বো যে মার গর্ভে একটা সন্তান নিয়ে বিপদসংকুল এ পথ পাড়ি দিচ্ছিলেন। যেখানে একবার পা পিছলালে ২০/৩০ ফুট নিচে পড়ে একটা ভয়াবহ অবস্থা হবে। ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে যখন আমার ছোট ভাইয়ে জন্ম হয় তখন বুঝেছিলাম কি বিপদসংকুল সময়ই না অতিক্রম করেছি আমরা।

টরন্টো
আগষ্ট ০৩, ২০০৪